উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বুধবার ২৮ কার্তিক ১৪২৪ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ১৭৬ সংখ্যা

সাধারণের কী হবে ?

ভোটের বালাই বড়ো বালাই। তাই গুজরাটে বিধানসভা ভোটের আগে ফের জিএসটি-র হারে বদল ঘটাল জিএসটি পর্ষদের বকলমে কেন্দ্র। মনে হতেই পারে, এর আগে তো একাধিক রাজ্যে ভোট হয়েছে, বিধানসভার নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছেও, তাহলে এই সময়েই জিএসটি-র হারে রদবদল ঘটানো হল কেন? কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের আমলে জিএসটি চালু করার জন্য যিনি উঠেপড়ে লেগেছিলেন সেই নরেন্দ্র মোদির নিজের রাজ্য গুজরাট। দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন দীর্ঘদিন। তাছাড়া এদেশের শিল্প জগতে গুজরাটকে একটু অন্য চোখেই দেখা হয় এখনও, তার পিছনে কিংবা সেই রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস যাই থাকুক না কেন। গুজরাট বিধানসভার ভোট গোটা বিজেপি টিমের কাছে বিশেষ মর্যাদার লড়াই। গত সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় আগে কেন্দ্রে বিজেপি আসীন হওয়ার পর থেকে দেশে যত নির্বাচন হয়েছে, তা সে লোকসভার আসন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত কিংবা ছাত্র পর্যায়ে, যেকোনো সাফল্যকেই মোদির জয় হিসাবে বর্ণিত করা হয়েছে। সেই চোখ দিয়ে দেখতে গেলে গুজরাট বিধানসভার ভোট বাস্তবিকই বড়ো আকারে মর্যাদার লড়াই। অতি সম্প্রতি, মধ্যপ্রদেশের একটি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে বিজেপি-কে হারিয়ে দলীয় প্রার্থীর জয় আরও উজ্জীবিত করেছে গুজরাট দাপিয়ে প্রচার করা কংগ্রেস নেতা-নেত্রীদের। এহেন লড়াইয়ের আগে জিএসটি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ ছিল গুজরাটের বণিককুলের মধ্যে। বিশেষ করে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা জিএসটি-র খামখেয়ালিপনায় এতটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে তাঁরা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ফল নিয়ে পরোক্ষে কার্যত হুমকিই দিয়ে রেখেছিলেন নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর সঙ্গীদের। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এটা বিলক্ষণ বোঝেন, গুজরাট কুপিত হলে বাকি ভারতে তাঁদের মুখ দেখানোই দায় হয়ে পড়বে। তাই ভোটের বড়ো বালাইকে সামনে রেখেই জিএসটি-র হারে রদবদল করে ব্যবসায়ীদের, আরও নির্দিষ্ট করে বললে গুজরাটের ব্যবসায়ীদের ঘরে লাভের অঙ্কটা যাতে বেশি হয় তার ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু তার পরেও যে ওই রাজ্যে সন্তোষের সুবাতাস বইছে এমনটা নয়। নতুন হারেও অসংগতি বিস্তর রয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। দেশজুড়ে এক কর ব্যবস্থা অর্থাৎ জিএসটি চালু হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত কয়েকবারই তার পরিবর্তন করা হয়েছে। সম্ভাবনা রয়েছে ভবিষ্যতে ফের হতে পারে। কিন্তু নতুন এই কর ব্যবস্থা চালু করার আগে দেশের সাধারণ মানুষের সামনে জিনিসের দাম কমার যে ছবিটা তুলে ধরা হচ্ছিল সরকারের তরফে তা কী হল সেটা পরিষ্কারভাবে এখন আর জানানো হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ হিসাবের মারপ্যাঁচ, কোন রাজ্যের ভোট, কোন দলের স্বার্থ-এসব কিছু বোঝে না, জানতে চায় না। তাদের জানার মূল বিষয় দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্রের দাম কমছে কিনা। জিএসটি-র আওতায় থাকা আরও ১৭৮টি পণ্যের উপর করের হার কমলেও বাস্তবেই বাজারে তার কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা সেটা জানতে চায় সাধারণ মানুষ। সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে, খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। গত সাত মাসের মধ্যে এই বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ। দাম বেড়েছে চাল, শাকসবজি, ডিম, দুধ সহ প্রায় সব জিনিসেরই। আর সাধারণ মানুষের কাছে তো তত্ত্ব, তথ্য, অঙ্কের মারপ্যাঁচের চেয়ে দৈনন্দিন সংসার খরচ বেড়ে যাওয়াটা বেশি গায়ে লাগে। শীতের শুরুতেও বাজারে প্রায় সব জিনিসের দামই বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই। জামাকাপড়, জুতো বা অন্যান্য ভোগ্যপণ্য মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা নয়। তাদের কাছে চাল, ডাল, তেল, নুন, শাকসবজি ইত্যাদি বিষয়গুলি রোজকার সঙ্গী। বাজারে গেলেই সেইসব জিনিসের দাম রীতিমতো গায়ে ফোসকা পড়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওষুধপত্র হয় অমিল কিংবা দাম কোথাও কমেনি। খুচরো বাজারে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোখার জন্য নাকি সরকারি কমিটি রয়েছে। কিন্তু সেই কমিটির চেহারাও তো অদৃশ্য। রাজনৈতিক দাদা, নেতাদের গায়ে এহেন আগুনের আঁচ সম্ভবত লাগে না তাঁদের ক্ষমতার কারণে কিন্তু দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকে। জিএসটি নিয়ে তাবড় নেতা, বোদ্ধাদের দড়ি টানাটানি, উন্নয়নের কূটকাচালি সাধারণ মানুষের পেট ভরানোর, রোজকার সংসারের বোঝা টানার দায়িত্ব নেয় না, ভার লাঘবও করে না। ফলে অসহায় মানুষজনের ক্ষোভ খানিকটা উগরে আবার তা গিলে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কারণ, চারপাশে অসহিষ্ণু রাজনৈতিক বাতাবরণ বারবারই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সীমা ছাড়ানো কোনোমতেই ঠিক নয়। যদিও সেই সীমা কে ঠিক করে দেয়, কী তার মাপকাঠি তার হদিস অবশ্য মেলে না।

অমৃতধারা

ভোগী ব্যক্তি দুঃখ থেকে পার পায় না। কারণ ভোগ জড়তার সঙ্গে সম্পর্কের জন্য হয় এবং জড়তার সঙ্গে সম্পর্কই জন্ম-মৃত্যুরূপ বিরাট দুঃখের কারণ। সাধারণ মানুষের যে ভোগে সুখ প্রতীত হয়, সেই ভোগকে বিবেকবান পুরুষ দুঃখস্বরূপ মনে করে, সেজন্য সে ওই ভোগে রমণ করে না, তার অধীন হয় না। যতদিন সাংসারিক সুখভোগের প্রবৃত্তি না মেটে, ততদিন যতই পড়াশোনা করো, যতই চতুর ও সমঝদার হও, যতই যোগ্যতাসম্পন্ন হও, যত বড়োই বক্তা হও, যতই পুস্তক লেখো-কিছুতেই পরম শান্তি পাবে না। সাংসারিক পদার্থের সংযোগে প্রাপ্ত সুখ আমাদের নয় তথা আমাদের জন্যও নয়, কেননা আমরা তো সদা স্থায়ী আর সুখ অস্থায়ী। মানুষের মধ্যে ভোগ ও সংগ্রহের প্রবৃত্তি বেশি হলে আকাল দেখা দেয়। আমাদের কাছে যে বস্তু, যোগ্যতা, সামর্থ্য আদি আছে- তা সমস্তই সমাজের, আমাদের নিজেদের নয়। আমরা ভুলবশত ওই বস্তু আদিকে নিজেদের ভেবে সুখে ভোগে লিপ্ত হই। এইজন্য বাধ্য হয়ে আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয়। যেখানে পার্থিব সুখলাভের আভাস দেখা যায়, বুঝে নিও সেখানে বিপদ। বস্তু-ব্যক্তি থেকে সুখের আশা মহান মূর্খতা।

-স্বামী রামসুখদাস

শব্দরঙ্গ ■ ১৮৪৫

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি ঃ ২। নাকের গয়না বিশেষ ৫। সমুদয়, সব ৬। তারার সমষ্টি, কয়েকটি তারার বিশেষ সমষ্টি ৮। বাঁশ বেত ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ঝুড়ি ৯। বিস্তীর্ণ জলাভূমি, জঙ্গল ১১। রাজা, বিচারক ইত্যাদিকে সম্বোধন ১৩। হুজুগ, ভিড় বা চাপ ১৪। ঘনিষ্ঠজনেরা যে নাম ধরে ডাকে।

উপর-নীচ ঃ ১। ভালো এবং খারাপ, মঙ্গল এবং অমঙ্গল ২। যে শব্দের দ্বারা ব্যক্তি প্রাণী স্থান ও বস্তুর সুনির্দিষ্ট পাওয়া যায়, খ্যাতি ৩। ঘর ছাওয়ার খোলা, খোলা দিয়ে ছাওয়া ঘর ৪। গল, গণ্ডদেশ ৬। নমনীয় মৌল ধাতুবিশেষ ৭। নরম রেশমি কাপড়বিশেষ ৮। ধাতু নির্মিত, ধাতু সম্বন্ধীয় ৯। সপ্তাহের সাত দিনের যেকোনো একটি, পালা, খেপ ১০। মুখে গ্রাস তোলার আওয়াজ ১১। ঢোল বা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানানো, প্রচার চালানো ১২। জমিদার বা সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত করে নেওয়া জমি। ১৩। শীত, তুষার বা শিশির।

সমাধান ■ ১৮৪৪

পাশাপাশি ঃ ১। কঙ্কতিকা ৩। বাজরা ৫। বচনবাগীশ ৬। চড়ক ৭। রামদা ৯। মহাফেজখানা ১২। পয়ার ১৩। কালাপানি

উপর-নীচ ঃ ১। কচকচ ২। কানাচ ৩। বাহবা ৪। রাবিশ ৫। বক ৭। রানা ৮। দানাপানি ৯। মধুপ ১০। ফেরার ১১। খামকা।

নিবেদিতা দক্ষিণা দিলেন নিজের জীবন পেলেন সমালোচনা, কুৎসা, চরম শত্রুতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ উত্তর সম্পাদকীয় ২য় পর্ব। প্রকাশিত হবে আগামী বুধবারও

মা সারদা তখন বাগবাজারে

বোসপাড়া লেনের একটি ভাড়া বাড়িতে। স্বামীজি মায়ের আশীর্বাদে মার্গারেটকে ধন্য করতে চান। মা যদি এই বিদেশিনীকে গ্রহণ করেন, রক্ষণশীল সমাজের প্রতিরোধ অপসৃত হবে। একদিন স্বামীজি মার্গারেট, মিসেস ওলিবুল ও মিস ম্যাকলাউডকে নিয়ে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের আবাসে এলেন। মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্য দেওয়ার আগের ঘটনা।

মা সারদার সামনে তিন বিদেশিনী। তাঁরা অতি সন্তর্পণে, সসম্ভ্রমে মায়ের ঘরে প্রবেশ করেছেন। যথোচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। তাঁরা জানেন কার কাছে এসেছেন। শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মা তাঁদের স্বাগত জানালেন। সকলের জন্যে ফল, মিষ্টি ইত্যাদি প্রসাদ এল। মা তাঁদের সঙ্গে বসে নিজেও প্রসাদ গ্রহণ করলেন নিঃসঙ্কোচে। সংস্কার কোনো বাধা হল না। সে যুগে এ এক অভাবনীয় ঘটনা।

এক দোভাষীর মাধ্যমে সেদিন তাঁদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা হয়েছিল। মা সারদা জানতে চাইলেন, 'তোমরা বাড়িতে কীভাবে পূজা করো? কী ধরনের প্রার্থনা!' আলোচনা শেষে তাঁরা যখন চলে যাচ্ছেন, মা তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। মৃদুকণ্ঠে মার্গারেটকে বললেন, 'তুমি আসায় আমার ভারী আনন্দ হয়েছে মা।'

স্বামী তেজসানন্দ লিখছেন, 'মার্গারেট-জননী মেরি ইসাবেল, যে ভাগ্যবতী দুহিতাকে আয়ারল্যান্ডের সূতিকাগৃহে ভগবতচরণে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আজ সন্ন্যাসীশিরোমণি আচার্য বিবেকানন্দের অপার করুণায় ভারতমাতার অভয় অঙ্কে তাঁহারই পুনর্জন্ম ঘটিল নিবেদিতা রূপে।'

একটি অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনার কথা স্বামী ভূমানন্দ মা সারদার জীবনীতে লিখেছেন, 'ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন ইংরাজ দুহিতা। বাংলাদেশে আসিয়াই তিনি প্রাণপণে বাংলা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মা যখন বোসপাড়া লেনে ছিলেন, নিবেদিতা তখন বাংলা ভাষায় কথাবার্তা অনেকটা বুঝিতে পারিলেও বলিতেন ভাঙা ভাঙা বাংলা। এই সময় নিবেদিতা প্রায়দিনই শ্রীশ্রীমায়ের পাদমূলে বসিয়া মায়ের কথা শুনিতেন ও ভাঙা ভাঙা বাংলায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। একদিন নিবেদিতা শাড়ি পরিয়া আঁচলে একগোছা চাবি বাঁধিয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি বাঙালি বধূগণের আঁচলে বাঁধা চাবি পিঠের পরে থাকিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু কীভাবে শাড়ি পরিলে উহা ওইরূপে রাখা অতি সহজ হয়, তাহা শিখিতে পারেন নাই। মায়ের পাশে বসিয়া কথা শুনিবার সময় বারবার সেই চাবির গোছাসহ আঁচল পিঠ হইতে সরিয়া পড়িতেছিল। আর সেই চাবি পিঠের উপর রাখিতে যাইয়া ঝমঝম শব্দ করিতেছিল। নিবেদিতার এই অবস্থা দেখিয়া মা হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'বাইরেও সাদা, ভিতরেও সাদা।'

মায়ের কথা শুনিয়া নিবেদিতা জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিলে, মা বলিলেন, 'এ কিন্তু ঠাকুরের কথা।' নিবেদিতা জানিতে চাহিলেন, কেন ঠাকুর একথা বলিয়াছিলেন। উত্তরে মা বলিলেন, 'একদিন ঠাকুর শুয়ে আছেন, এমন সময় আমি তাঁর খাবার নিয়ে গেলুম। গিয়ে দেখি তিনি ঘুমোচ্ছেন। আমি নিঃশব্দে থালা রেখে দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি চোখ মেলে বললেন, 'খাবার এনেছ? আমি কিন্তু এমন এক দেশে গিয়েছিলুম, যেখানে সকলেরই বাইরে সাদা, ভিতরে সাদা।'

নিবেদিতা জানিতে চাহিলেন, 'ঠাকুর একথা কখন বলেছিলেন!' উত্তরে মা বলিয়াছিলেন, তখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে। তারপর সময় বুঝাইবার জন্য মা সনের উল্লেখ না করিয়া, রথযাত্রার দিনের উল্লেখ করিলেন। নিবেদিতা একখানা কাগজে সন ও রথযাত্রার কথা লিখিয়া লইয়া মাকে প্রণাম করিয়া সেদিনের মতো বিদায় লইলেন।

'নিবেদিতা মায়ের নিকট হইতে আসিয়া ঠাকুরের ভক্ত ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষের সহিত দেখা করিয়া মায়ের কথিত বাংলা সন-তারিখের সহিত ইংরাজি সন-তারিখ মিলাইয়া আনিলেন ও বাড়িতে ফিরিয়া সালের হিসাব করিলেন। দুইদিন পরে নিবেদিতা মায়ের নিকট আসিয়া ভাঙা ভাঙা বাংলায় মাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম হইল-মা, ঠাকুর যেদিন বলিয়াছিলেন যে এমন এক দেশে গিয়েছিলুম, যাদের বাইরে সাদা, ভিতরে সাদা। আপনার আশ্চর্য নৈপুণ্য আপনাদের আছে। কিন্তু এই রক্ষণশীলতা দ্বারা আপনাদের জাতি বিশ্বের সর্বোত্তম অধ্যাত্ম সম্পদগুলিকে একাল ধরে অবিকৃতভাবে রক্ষা করতে পেরেছে। এই জন্যেই আমি ভারতবর্ষে এসেছি জ্বলন্ত আগ্রহে তাঁর সেবা করবেন বলে। ভারতের আত্মাকে আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি।'

এইবার এল মহাপরীক্ষার কাল। কলকাতায় প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ করল। মহাতঙ্ক। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন, 'প্লেগের সময় কলকাতায় কী আতঙ্ক! কলকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনা সাফ করিবার জন্য ঝাড়ুদার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখিলাম, ঝাড়ু ও কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করিতে নামিয়াছেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্তে লজ্জাবোধ করিয়া বাগবাজার পল্লির যুবকেরাও অবশেষে ঝাড়ুহাতে রাস্তায় নামিল। পরে শুনিলাম এই বিদেশিনীই ভগিনী নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দ 'ইহাকে লন্ডন হইতে আনিয়াছেন। নাগরিক জীবনে স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রথম পাঠ আমরা ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতেই পাইয়াছিলাম। এই প্লেগ উপলক্ষ করিয়াই তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।'

> 'প্লেগের সময় কলকাতায় কী আতঙ্ক! কলকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনা সাফ করিবার জন্য ঝাড়ুদার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখিলাম, ঝাড়ু ও কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করিতে নামিয়াছেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্তে লজ্জাবোধ করিয়া বাগবাজার পল্লির যুবকেরাও অবশেষে ঝাড়ুহাতে রাস্তায় নামিল। পরে শুনিলাম এই বিদেশিনীই ভগিনী নিবেদিতা'

গুরুকৃপায় নিবেদিতা ধীরে ধীরে আকর্ষিত হতে থাকলেন ভারতবর্ষের অন্তরাত্মায়। পাশ্চাত্য শরীরে প্রবেশ করল প্রাচ্য 'মন-ভাব' সত্য। স্বামীজির সঙ্গে অমরনাথে, কাশ্মীরে, শেষে ক্ষীরভবানী। অমরনাথে স্বামীজি মহাদেবের কাছ থেকে পেলেন ইচ্ছামৃত্যু বর।

নিবেদিতা ফিরে এলেন কলকাতায় ১৮৯৮ সালে। নভেম্বরের প্রথম ভাগ। মা সারদার কাছে রইলেন আট-দশ দিন। এরই মধ্যে ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনে একটি বাড়ি নিলেন। বাড়িটি কেমন? তাঁর নিজের বর্ণনায়, 'ঠান্ডা, স্যাঁতসেঁতে, অস্বাস্থ্যকর।' কিন্তু তাঁর মনে হল অতিমনোরম। হিন্দু স্থাপত্য। ছোটো ছোটো ঘর, নীচু ছাদ। মাঝখানে বড়ো একটি উঠান। পবিত্র একটি তুলসীগাছ। পাশ দিয়ে একটি গলিপথ এঁকেবেঁকে সুদূরে চলে গেছে। পল্লির শিশুরা পথে ছোটাছুটি করে। প্রভাত আসে, সন্ধ্যা নামে, শঙ্খধ্বনি। রাত ক্রমশ গভীর হয়। সব শব্দ স্তব্ধ।

পরবর্তীকালে বলেছিলেন, 'এই গলিটি আমাকে দত্তক নিয়েছে।' বেলুড় মঠ থেকে স্বামীজি এই গৃহে এসে তাঁর মানসকন্যাটিকে ধীরে ধীরে এক তপস্বী করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুভবে, 'শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল-তিনিও অনেকদিন অর্ধাশনে, অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়িতে বাস করিতেন, সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবুও ডাক্তার বা বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই।...ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, মোহ ছিল না, সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ একটি অপূর্ব কথা লিখেছিলেন, 'এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান, তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে!'

স্বামীজির ভারতে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল স্ত্রীশিক্ষা, সমাজে নারীর স্থান, নারীর অধিকার। এই বিরাট কাজটি নিবেদিতাকে করতে হবে। এই বাড়িতেই স্বামীজির পরিকল্পিত বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হল ১৩ নভেম্বর, ১৮৯৮ সালে। সেদিন ছিল কালীপূজা। উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ। প্রতিষ্ঠাপর্ব শেষ হল। শ্রীশ্রী মা আশীর্বাদ করলেন, 'মহামায়ার শুভাশিস শতধারে বর্ষিত হোক।' নিবেদিতা লিখছেন, 'আগামীকালের শিক্ষিত নারীসমাজের উদ্দেশে উচ্চারিত শ্রীশ্রীমায়ের এই অমোঘ আশীর্বাণী হইতে অধিক মঙ্গলসূচক আর কী হইতে পারে!' সর্বপ্রথমে এই বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছিল, 'শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়।' স্থানীয় মানুষরা বলতেন, 'নিবেদিতা স্কুল'। বিদেশিনীরা বলতেন, 'বিবেকানন্দ স্কুল'। ১৯১৮ সালে স্কুলটি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর নাম হল 'রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।'

গুরুকে দক্ষিণা দিলেন নিজের জীবন। পরাধীন ভারতের আত্মবিস্মৃত মানুষের কাছ থেকে গুরু এবং শিষ্যা কিছুই প্রত্যাশা করেননি। না, একটি জিনিস তাঁরা অবশ্যই পাবেন, সেটি হল সমালোচনা, কুৎসা, চরম শত্রুতা। পেয়েছিলেন, এই ব্যাপারে বঙ্গবাসী তাঁদের বিমুখ করেননি। নিবেদিতার শেষটা যেন 'ডেথ রান'। ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর, সকাল সাতটা। স্থান দার্জিলিং। নিবেদিতা দেহ ছেড়ে দিলেন। যুদ্ধ তখন তুঙ্গে। ভারতের জনজীবন তখন ঘূর্ণাবর্তে।

কথা ও আমার ডায়েরি মিলাইয়া দেখিলাম, ঠিক ওইদিন আমি স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। এই দেখার অনেক বৎসর পরে স্বামীজি বিলাতে আসিলেন। একদিন তাঁহার কাছে আমার সেই স্বপ্নে দৃষ্ট পুরুষের এক আলোকচিত্র দেখিয়া আমি বিলক্ষণ চঞ্চল হইয়া জানিতে চাহিয়াছিলাম, ইনি কে? স্বামীজি আমার ভাব লক্ষ্য করিয়া অল্প কথায় বলিয়াছিলেন, 'আমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস, যাঁহার পাদমূলে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি ধন্য'। আমি তখন স্বামীজিকে আমার স্বপ্নের কথা বলিলাম ও পরদিন স্বামীজিকে ডায়েরি আনিয়া দেখাইলাম।'

মা বলেছিলেন, 'তুমি যে নরেনের মেয়ে, তাই ঠাকুর তোমায় দেখা দিয়েছিলেন।'

সময়ই ইতিহাসের রচয়িতা, অদৃশ্য এক জীবনীকার। তৈরি হল একটি চতুষ্কোণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতা। মাঝখানে ভারতভূমি, যজ্ঞভূমি। বাগবাজারের বোসপাড়ায় মিলিত হয়েছেন যাঁরা তাঁদের সকলেরই বয়েস পঞ্চাশের কম। মা সারদার বয়স ৪৬ বছর, স্বামীজি ৩৬ বছরে পা রেখেছেন, নিবেদিতার বয়েস মাত্র ৩২ বছর।

১১ মার্চ, ১৮৯৮। কলকাতার স্টার থিয়েটার লোকে-লোকারণ্য। স্বামী বিবেকানন্দ আজ কলকাতার মানুষের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় করাবেন। 'ইংল্যান্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব বিষয়ে বক্তৃতা করবেন সিস্টার নিবেদিতা। সভায় তিল ধারণের স্থান নেই। স্বামীজি এই বলে পরিচয় করালেন, 'ভারতে মিস মার্গারেট নোবল ইংল্যান্ডেরই আর একটি দান।'

নিবেদিতা তাঁর ভাষণে বললেন, 'দীর্ঘ ছয় হাজার বছর ধরে রক্ষণশীল হয়ে থাকবার

জনমত

'নিঃশব্দ বিপ্লব' আরও বহুদূর বিস্তৃত হোক

সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'নিঃশব্দ বিপ্লব' যথোচিত এবং সময়োপযোগী হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, রেল কর্তৃপক্ষ এবার থেকে রিজার্ভেশন স্লিপে পুঃ/স্ত্রী ব্যতিরেকে তৃতীয় লিঙ্গের ভ্রমণকারী হলে তাও উল্লেখ করতে হবে। এই যে তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্ভুক্তি তা তো একটা বিপ্লবই। কারণ এদের অন্তর্ভুক্তিতে এঁরাও প্রথম ও দ্বিতীয় লিঙ্গের মতো সমান মর্যাদার দাবিদার হলেন। সমাজ এঁদেরকে কখনও স্বীকৃতি দেয়নি। কেবল অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাঁদেরকে দেখেছে। এঁদেরকে আমরা চিনি, যখন হাততালি দিয়ে বা নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে আমাদের সামনে সাহায্যের জন্য দাঁড়ায়। কিংবা বাড়িতে নবাগতের বা নবাগতার আগমনে ঢোল বাজিয়ে আনন্দের গান গেয়ে নতুন অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে যায় আর বিনিময়ে সামান্য বকশিশের ঘ্যা করে। আমরা কখনও খুশি হয়ে বা কখনও অখুশি হয়েই তাঁদেরকে যেন কৃপা করলাম এভাবে কিছু পয়সা দিই।

কিন্তু একবারও ভেবে দেখি না যে, তাঁদের বুকের ভেতর কতখানি হাহাকার নিয়ে আমাদের নতুন অতিথিদের তাঁরা আপ্যায়ন করে যান, তাদের নিয়ে আনন্দ করে যান।

এটা ভালোই হল যে, তাঁরা অন্তত সমাজের কাছে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেল। তাঁদের জন্মের সময় যে ত্রুটিটা ধরা পড়েছে তার জন্য তো তাঁদেরকে কোনোভাবেই দায়ী করা যায় না। প্রকৃতির কোনো এক অজানা রহস্যে তাঁরা আজ এই তৃতীয় লিঙ্গ হয়ে পৃথিবীতে রয়েছেন।

স্বীকৃতি তো তবু হল। কিন্তু তাঁদের আয় ? আয়ের পন্থা না হলে তাঁরা চলবেন কী করে ?

একটা হতে পারে, দেশে তো তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়। তাই সরকার থেকে একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে তো তাঁদের সার্বিক কল্যাণ হবে না। তাঁরা তো সেই কৃপার পাত্রই রয়ে যাবেন। যদিও সরকার নাকি বিবেচনা করছেন তাঁদেরকে পুলিশের চাকরিতে নেওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু তাতেও সমস্যা যাবার নয়। কারণ যে কোনো চাকরিতে ন্যূনতম শিক্ষার মান তো প্রয়োজন। যাঁরা এতদিন পর্যন্ত সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে বেঁচে আছেন তাঁরা ন্যূনতম শিক্ষাটাই বা কী করে পাবেন ?

কাগজে একটা সংবাদ দেখলাম মেয়েদের হস্টেলে পুরুষ রাঁধুনি কিংবা পুরুষ পাহারাদার নিয়ে সমস্যা হচ্ছে এবং তার জন্য ছাত্ররা আন্দোলনে। হঠাৎ মাথায় এল সে কাজের জায়গাগুলোতে আমরা একটু শিখিয়ে পড়িয়ে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিত্বদেরকে কাজে নিয়োগ করতে পারি।

যেমন মেয়েদের স্কুল-কলেজে গার্ড, বেয়ারা, অফিসের লিফট অপারেটর, যানবাহনে সহকারী ইত্যাদি হাজারো চাকরি আছে। যেখানে শক্ত, সমর্থ জনের প্রয়োজন আছে। আর যতটুকু দেখা যায় এই তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যথেষ্ট সবল।

তাঁদেরকে কিছু নির্দিষ্ট ট্রেনিং দিয়ে সরকার অনায়াসে এই সমস্ত চাকরিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। প্রশাসন এ প্রস্তাব ভেবে দেখলে ভালো হবে।

এই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তথা তাঁদের সামাজিক স্বীকৃতি পেতে সাহায্য করতে পারে তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তাই তাঁদের স্বনির্ভর করতে হবে।

শশাঙ্কশেখর গুহ
নবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে গাফিলতি

রাজ্যে সর্বত্র জেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব। ডেঙ্গুতে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যাও কম নয়। উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ির পর আলিপুরদুয়ারে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি। প্রতিরোধে পুর প্রশাসনের গাফিলতি নজরে পড়ছে। প্রতি ওয়ার্ডে মশার লার্ভা ও মশা ধ্বংসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না।

প্রণব সূত্রধর
আনন্দনগর, আলিপুরদুয়ার।

শিশুদের পাশে দাঁড়ান

আমরা জানি, একটা বাগানে সুন্দর ফুল ফোটাতে গেলে চাই ভালো মালি, চাই চারাগাছের পর্যাপ্ত পরিমাণ যত্ন। তেমনই একটি শিশুকেও ঠিকঠাক গড়ে তুলতে অভিভাবকের জন্যেও একই নিয়ম। শিশুর চাই স্নেহ-মায়া-মমতাপূর্ণ যত্ন। কিন্তু আমরা অভিভাবকরা বড়ো চাকরি, প্রচুর অর্থের স্বপ্ন দেখতে দেখতে মানবিক চেতনার দুয়ার থেকে শিশুকে সরিয়ে আনি। অভিভাবকের উচ্চাশার শিকার হয় শিশুরা। শৈশব কাকে বলে তারা জানতে পারে না।

আমাদের দেশে এখন এমন শিশু প্রয়োজন যারা ভালো ডাক্তার, ভালো ইঞ্জিনিয়ার, সর্বোপরি সুনাগরিক হয়ে উঠতে চায়। তাদের দিতে হবে স্বাস্থ্য আর পুষ্টি। শিশুদের জন্যে এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে।

অনেক সময় এমনটা শোনা যায়, বড়ো বড়ো হোটেলে রাতে নক করে নাকি বোর্ডারকে জিজ্ঞেস করা হয়- রাতের সঙ্গী হিসাবে নারী চাই না পুরুষ ? ওরা শিশু সঙ্গীরও জোগান দেয়। শুনে বিস্মিত হতে হয়। শিশুদের পণ্য করছে যারা তাদের শায়েস্তা করতে সবাই ঐক্যবদ্ধ হোন।

লক্ষ্মী নন্দী
মেখলিগঞ্জ।

সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারদের বঞ্চনা ঘুচবে কবে ?

রাজ্যের অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর (সিভিল ডিফেন্স) প্রতি জেলাতেই প্রতিবছর একঝাঁক যুবক-যুবতিদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করে। প্রতিবছরই নিয়মমাফিক একঝাঁক যুবক-যুবতি এই সিভিল ডিফেন্স দপ্তর থেকে বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়ে থাকেন।

তারপর জেলা প্রশাসনের কর্তারা অগ্নিকাণ্ড, জলডুবি, ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিপর্যয়কালে এইসব প্রশিক্ষিত কর্মীদের ব্যবহার করেন। এই কর্মীরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে বিপর্যয়কালে ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্যের জীবন রক্ষা করে থাকেন। এমনভাবে পাঁচ, দশ, এমনকি পনেরো বছর ধরেও কাজ করছেন অনেক ভলান্টিয়ার। কিন্তু চাকরির সময় তাঁরাই হন বঞ্চিত। চাকরি পেয়ে যান প্রশিক্ষণহীন অন্যরা। এটা সহজেই অনুমেয় যে এর কারণ- দুর্নীতি। এঁদের সঙ্গে এমন বঞ্চনা আরও কতদিন চলবে কে জানে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতারও হয়েছেন কোচবিহারের জনৈক সিভিল ডিফেন্স আধিকারিক। নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন জেলা প্রশাসনের। অন্যথায় সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার অ্যাসোসিয়েশনকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তুলতে হবে।

জয়গোপাল ভৌমিক
টেলিফোন এক্সচেঞ্জপাড়া, দিনহাটা।

ভোটই সব

গুজরাটের ভোটকে সামনে রেখে যেভাবে জিএসটি ঢেলে সাজানো হল তাতে মোদি সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হল কি ? এই সরকারের ভোটই কি একমাত্র লক্ষ্য ? সত্যি, ভাবলে বিস্মিত হতে হচ্ছে।

সুমিতা দে
শিবমন্দির, দার্জিলিং।